এ যেন অচেনা এক দেশ

—অতসী দেবরায়

অনেকের মুখেই শুনেছি জাপান খুব সাজানো, সুন্দর একটা দেশ। তবু কোনদিন জাপানে বেড়াতে যাব এমন ইচ্ছা মনে দানা বাঁধেনি। জাপান বললেই মনে পড়ে পরমাণু বোমায় হিরোসিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসের ইতিহাস, কিংবা, ফুজিয়ামার অগ্ন্যুৎপাতের ভয়াবহ বিবরণ। তবে শুধুই ধ্বংসের কথা নয় – জাপান সম্পর্কে আছে বেশ কিছু সুখস্মৃতিও। স্কুলে পড়ার সময় আমরা রঙীন কাগজ ভাঁজ করে নানান জিনিস তৈরি করতে শিখেছিলাম। এই কারুশিল্পের স্রষ্টা জাপান – নাম 'অরিগ্যামি'। জেনেছিলাম, জাপানীরা এক অপূর্ব কায়দায় ফুল সাজায়, যাকে বলে 'ইকেবানা'। এছাড়া, জাপানী পাখা, কিমোনো পরা কাঠের জাপানী পুতুল কিংবা সুমো রেসলারের সঙ্গে কম-বেশি পরিচয় আমাদের সবারই আছে। ব্যাস, এটুকুই। জাপান সম্বন্ধে এই হলো আমার জ্ঞানের পরিসর। তাই বারোদিনের জাপান ভ্রমণের পরিকল্পনা করার সময় অন্যের সাহায্য নিতান্তই আবশ্যক। আর বর্তমান যুগে এই 'অন্য'দের মধ্যে অন্যতম বিশেযজ্ঞের নাম AI। অতএব, মানুষের বুদ্ধি আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মেলবন্ধন ঘটিয়ে তৈরি হল ভ্রমণসূচী। তালিকাভুক্ত হল – ইয়ামানাকা লেকের ধারে গিয়ে ফুজিয়ামা দর্শন,জাপানী সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী স্বপ্ননগরী ও পুরোনো রাজধানী কিওটো বেড়ানো, বরফে ঢাকা নাগানো আর তার কাছাকাছি জনপদে বিচরণ এবং সর্বোপরি, বর্তমান রাজধানী ও পৃথিবীর ব্যস্ত শহরগুলির মধ্যে অন্যতম টোকিও শহরের জনজোয়ারে গা-ভাসানো।

মূলতঃ চারটি বড় ও অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে সমগ্র জাপান দেশ। তার মধ্যে হনশু হল জাপানের মূল ভূখন্ড। আমার প্লেন যখন এই হনশু দ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত টোকিও শহরের ভূমি স্পর্শ করল তখন জাপানের ঘড়িতে বাজে বিকেল পাঁচটা। যথারীতি অভিবাসনের লম্বা লাইনে এসে দাঁড়ালাম। শুনেছিলাম জাপানীরা মিতভাষী। 'মিতভাষী' বললেও বুঝি কম বলা হয় – একেবারে বিনাবাক্যব্যয়ে অন্য দেশে immigration যে সম্ভব তা নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া বিশ্বাস করা কঠিন। ব্যাগপত্র সংগ্রহ করে এয়ারপোর্টের মধ্যেই দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছি – কানে একটা অতি পরিচিত সুর ভেসে এলো। বিভিন্ন অচেনা লোকেরা এক অদ্ভুত অথচ চেনা সুরে কি যেন বলে চলেছে। মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় মাঝরাতে কোন স্টেশনে ট্রেন থামলে ঠিক এমনই সুরে নীচু গলায় চা-ওয়ালা ডেকে যেত – 'চায়ে গরমমম....'। জাপানী ভাষা বোঝার উপায় নেই তাই নিজের মত করে ধরে নিলাম ওরাও নিশ্চয় কোন জিনিস বিক্রি করছে। পরে অবশ্য জেনেছিলাম আমার অনুমান একেবারেই ভুল। ওরা বলছে – 'কন্নিচিওয়ায়ায়া...' – যার মানে 'হ্যালো'। চেনা-অচেনা, দেশী-বিদেশী সকল মানুষের প্রতি জাপানবাসীর উষ্ণ অভিবাদন।

টোকিও শহরটা চেহারায় এবং ব্যস্ততায় আর পাঁচটা আন্তর্জাতিক মানের বড় শহরের মতই। শহর ও শহরতলী রেল ও বাসপথে সুসংযুক্ত। শহরের একদিকে যেমন আছে প্রাচীন মন্দির সেনসো-জি আর সেই মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে জাপানের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের বিপণনক্ষেত্র, অন্যদিকে তেমনি আবার মহাসমারোহে চলেছে বিশ্বের সমস্ত প্রথমসারির নামজাদা কোম্পানির বিকিকিনি। জায়গাটার নাম আসাকুসা – যেখানে টোকিওর প্রাচীনতম মন্দির সেনসো-জির অবস্থান। কথিত আছে, দুই মৎস্যজীবী – হামানারি এবং তাকেনারি মাছ ধরতে গিয়ে করুণাময়ের (Kannon - the god of mercy) এক মূর্তি খুঁজে পায় ও বাড়িতে এনে রাখে, ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে সেই জায়গাতেই স্থাপিত হয় সেনসো-জি অর্থাৎ, সেনসো মন্দির। আসাকুসার পথে পথে কারুশিল্পীরা বসেছে পসরা সাজিয়ে আর আমার মত বহু পর্যটক শিল্পকর্ম উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে রসনার তৃপ্তি ঘটাচ্ছে নানারকম জাপানী স্ট্রিটফুড খেয়ে। অন্যদিকে আলো ঝলমলে গিনজা অঞ্চলের চেহারা অত্যাধুনিক। গিনজার রাস্তায় খানিকটা সময় কাটালেই বোঝা যায় যে বাণিজ্যক্ষেত্রে জাপান এক বিশেষ শক্তি।

টোকিওর মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটা স্টেশনে নামলাম – নাম শিবুয়া। জানতে পারলাম, এই শহরের ব্যস্ততম চৌরাস্তাগুলির মধ্যে এটা একটা। ঘড়িতে তখন সন্ধ্যে সাতটা। শিবুয়া মোড়ের মাথায় রাস্তা পার হতে গিয়ে মনে হল যেন দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় পূজাপরিক্রমায় বেড়িয়েছি। একটা সাধারণ দিনে এতো ভিড়! শিবুয়া মোড়ের আরো একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই প্রবল জনসমুদ্রে বন্ধুবিচ্ছেদ হলে এই মোড়ের মাথায় একটা স্ট্যাচু আছে তার সামনে এসে লোকে দাঁড়ায় দলছুট বন্ধুর অপেক্ষায়। সেই স্ট্যাচুটার নাম 'হাচি-কো'। হাচি এক অত্যন্ত প্রভুভক্ত কুকুরের নাম। সে তার মনিবের সঙ্গে রোজ সকালে এই মোড়ে আসত। এখান থেকে ট্রেনে করে মনিব যেতেন অফিসে আর হাচি বিকেল পর্যন্ত এখানেই বসে অপেক্ষা করত তার মনিবের। দিনে দিনে পথচারীদেরও আপন হয়ে ওঠে সে। একদিন তার মনিব আর ফিরলেন না। শোনা যায়, অফিসেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। হাচি কিন্তু তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই জায়গাতেই বসে থাকে তার মনিবের প্রতীক্ষায়। আশেপাশের লোকরা আর পথচারীরা তাকে খাবার ও শীতবস্ত্রের জোগান দিয়ে যায়। তার জীবনাবসানে, তার অটল প্রভুভক্তিকে কুর্নিশ জানিয়ে নির্মিত হয় হাচি-কো স্মৃতিসৌধ। 'কো' শব্দটির একাধিক মানে আছে। যেমন, 'ইয়ামানাকা-কো' বলতে বোঝায় ইয়ামানাকা লেক। কিন্তু, এখানে 'কো' মানে শিশু। ভালোবাসায় স্বার্থত্যাগের যে নজির তুমি গড়ে গেলে হাচি-কো, মানুষ তা করতে না পারলেও তোমাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে কোন জায়গা বেশি ভালো – ইউরোপ, আমেরিকা নাকি জাপান? আমি নিরুত্তর। প্রত্যেকে যে যার মত করে সুন্দর – যতক্ষণ তারা স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছে, নিজের সংস্কৃতি ও জীবনের রীতিরেওয়াজ নিজের মত করে গড়ে তুলেছে ততক্ষণ সে সমহিমায় বিরাজমান। তবু, না চাইতেই দু-একটা তুলনা মনে চলে আসে। যেমন –

জাপানের ট্রেনে যাত্রী সংখ্যা ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশি। যদিও ইংল্যান্ডের ট্রেনে উপচে পড়া ভিড় আমি দেখেছি, তবু বলব, জাপানের ভিড় আমাদের বনগাঁ লোকালের ভিড়ের সমতুল। তফাৎ শুধু

এইখানে যে বনগাঁ লোকালে সেই সঙ্গে থাকবেই যাত্রীদের মধ্যে দৈহিক ও মৌখিক সংঘাত। কিন্তু, নিজে না দেখলে বলতাম সবাই বাড়িয়ে বলে – তিলধারণের জায়গা নেই ট্রেনে অথচ সবাই নিশ্চুপ। এ যেন এক মৌন মিছিল!

দ্বিতীয় ঘটনাটা আমাকে আরও বেশি বিস্মিত করেছে। আমস্টার্ডামের ট্রামে একটু বেশি লোক উঠলে ড্রাইভারকে বলতে শুনেছি যে 'নিজের জিনিস নিজের কাছে রাখুন – পকেটমার হতে পারে'। জাপানের ট্রেনেও এমনই এক ঘোষণা হয়ে চলেছে যে 'নিজের জিনিস নিজের কাছে রাখুন – যাতে অন্য লোকের অসুবিধা না হয়'। নিজের পাশাপাশি অন্যের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখার প্রশিক্ষণ যাদের সে জাতি সামগ্রিকভাবে উন্নতি করবে এটাই তো স্বাভাবিক।

সবার সুবিধা কিংবা আরামের কথা ভাবার নিদর্শন জাপান ভ্রমণের প্রতি পদে আমি অনুভব করেছি। হয়তো এই বিশেষ বোধের নিরিখে জাপান অন্য সব দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে। আমরা টোকিও থেকে শিনকানসেন বা বুলেট ট্রেনে চড়ে এলাম নাগানো বলে একটা ছোট্ট শহরে। এর আগে, টোকিও বা কিওটোর মতো বড় শহরের রেলস্টেশনে দেখেছি সারবাঁধা লকার – যেখানে পর্যটকেরা টাকার বা কয়েনের বিনিময়ে তাদের ব্যাগপত্র জমা রেখে ঝাড়া হাত-পায়ে বেড়াতে পারে। তাই এই ব্যবস্থার নাম 'কয়েন লকার'। নাগানোর মতো ছোট জায়গাতেও দেখি এই ব্যবস্থা আছে। আমরাও স্টেশনেই বোঝাহীন হয়ে একটা বাসে উঠে পড়লাম – গন্তব্য ঃ স্নো-মাঙ্কি পার্ক (snow monkey park)। তুষারশুভ্র পাহাড়ী পথ বেয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দেড়-দু কিলোমিটার হাঁটার পর দেখা মিলল একরাশ বাঁদরের – হাড়কাঁপানো শীতে বরফ খুঁড়ে কি যেন খেয়ে চলেছে তারা অনর্গল। সেখানেই আছে এক উষ্ণ প্রস্রবন, জাপানীতে যাকে বলে 'অনসেন'। শরীর গরম করতে মাঝেমাঝেই এই বাঁদরের দল ডুব দেয় অনসেনের জলে। তখন দুপুর বারটা – বাইরের তাপমাত্রা মাইনাস চার ডিগ্রি সেলসিয়াস, অথচ, সেই ঠান্ডার মধ্যে প্রস্রবনের গরম জল থেকে ধোঁয়া উঠছে। প্রকৃতির এই রূপবৈচিত্র্য উপভোগ করতে নানান দেশ থেকে এসেছে আমাদের মতো অনেক পর্যটক। যাত্রা শুরুর আগেই আমরা স্টেশন সংলগ্ন একটা ছোট দোকান থেকে কিনে ছিলাম – একটা পলিথিনের মোড়কের মধ্যে ২ ইঞ্চি × ৩ ইঞ্চি পাতলা বালিশের মতো ৪-৫টা প্যাকেট। জেনেছিলাম যে ওই বালিশগুলো হাতে ঘষলে হাত গরম হয়। সত্যিই তো! কনকনে ঠান্ডায় যখন হাত-পায়ের আঙুল ব্যথা হয়ে যাচ্ছে তখন ওই বালিশের গরমে সব স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। এটা কি ম্যাজিক নাকি? কৌতুহল বাড়ল। বিষয়টা পড়ে দেখে যা জানলাম তাতে আমি সত্যিই হতবাক। রসায়নের এক সাধারণ তত্ত্ব যা ছোটবেলায় আমরা সবাই পড়েছি, কিন্তু এরকম ভাবে যে একে ব্যবহার করা যায় তা কোনদিনও ভাবিনি। এ দেশ যে কেন বিশ্বসেরা তা আবার অনুভব করলাম! ওই বালিশগুলির মধ্যে আছে গুঁড়ো লোহা, নুন আর ভার্মাকুলাইট নামের এক উপাদান। লোহা আর নুন পরিবেশের জলে জারিত হয়ে তৈরি করে মরিচা আর এই বিক্রিয়ায় অনেক তাপ উৎপন্ন হয়। ভার্মাকুলাইট অনেক ঘন্টা পর্যন্ত ওই তাপ ধরে রাখে বালিশের মধ্যে। অতএব, ... বাকি ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

নাগানো থেকে এবার এলাম মাৎসুমোতো। এও এক ছোট শহর। জাপানের বড় তিনটে দুর্গের মধ্যে একটা আছে এখানে – মাৎসুমোতো জো। জাপানী ভাষায় জো মানে দুর্গ। দুর্গ ঘুরে দেখার পর একটা

লোকাল ট্রেনে চড়ে এলাম নাড়াই-সুকো বলে একটা গ্রামে। বরফে ঢাকা পাহাড়ে ঘেরা শান্ত নাড়াই গ্রামে যখন রেলগাড়ি এসে থামল তখন আমার ছেলেবেলার স্মৃতি মনে ভেসে উঠল। আধুনিকতার সমস্ত সুবিধা আছে তবু এ জায়গাটা যেন প্রযুক্তির শিকলে তেমনভাবে বাঁধা পরেনি। রেলগাড়ির চালক স্বয়ং যাত্রীদের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করছেন, যন্ত্রের বদলে মানুষই টিকিট দিচ্ছে এবং যাত্রীদের থেকে তা সংগ্রহ করছে। যে দেশের এয়ারপোর্টে হুইল চেয়ার 'I am free you can use me' এই তকমা এঁটে নিজেই চলে ফিরে বেড়ায়, সে দেশ সবটাই যন্ত্রনির্ভর নয় তা দেখে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। প্ল্যাটফর্ম ধরে এগিয়ে এসে বেরোনোর মুখে চোখে পড়ল একটা কোণায় রবার স্ট্যাম্প আর লাল-কালো কালি। এই বিষয়টা একটু বলি – কোন স্থানকে চিরকালের জন্য স্মৃতিবন্দি করে রাখার এমন উপায় এর আগে আমি অন্য কোন দেশে দেখিনি। জাপানের যে কোন পর্যটনস্থল, যেমন, মন্দির, জাদুঘর (মিউসিয়াম), দুর্গ এমনকি রেলস্টেশনেও এরকম এক কোণে রাখা থাকে অলঙ্কৃত রবারস্ট্যাম্প আর পর্যটকেরা পকেটে নিয়ে ঘোরে একটা ছোট নোটবুক। আমাদের ছোটবেলায় যেমন পোস্টাল স্ট্যাম্প সংগ্রহের রেওয়াজ ছিল এও অনেকটা সেইরকমই। আধুনিকতার ফাঁকে ফাঁকে প্রাচীনতার এই সুবাস মনকে নাড়া দেয় বৈকি।

সব ভালোর অন্তরালে কিছু মন্দ লুকিয়ে থাকবেই – এটাই প্রকৃতির নিয়ম। জাপানেও এর ব্যতিক্রম হবে না – সেটাই স্বাভাবিক। সমগ্রজাতি যখন নিয়মনিষ্ঠ ও কাজপাগল হয়ে ওঠে তখন 'ইচ্ছে'-রা যে কোন্‌সময় জীবন থেকে ডানা মেলে উড়ে যায় তার হদিশ মেলা ভার। কাজ – আরও কাজ – আরও নিখুঁত কাজ...। একটা সমীক্ষায় পড়লাম – জাপানের নবীনপ্রজন্ম ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে। বিষয়টা সত্যিই উদ্বেগের। ইদানিংকালে বহির্বিশ্বের কাছে জাপান তার কর্মক্ষেত্রের দ্বার উন্মুক্ত করেছে; কাজের সময় কমিয়ে সামাজিক মেলামেশার সময় বাড়ানোর প্রস্তাবও নাকি এসেছে।

যদি কোন রাজপুত্র সমুদ্রপারের দূত হয়ে বয়ে আনে এদেশের দুর্লভ ভেট – 'উৎপাত', যদি কোন হরতনীর মন ভ্রমরের গুঞ্জনে কেঁপে ওঠে আর তারই দোলায় যদি কোন রুইতনের নিয়মনিষ্ঠতায় একটু ছেদ পড়ে – আজ জাপান হয়তো সেই দিনের প্রতীক্ষায়।